24
আজকের কাগজ
তারিখ 10 AUG 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

ক্যাম্পাসঃ সন্ত্রাসের শিশুপাঠ

মারুফ চিনু

বোমা-ককটেলতো শিশুপাঠ্য। পিস্তল-রিভলবার-পাইপগান-কাটা রাইফেল-বন্দুক এই ক'বছরেই পুরনো। সাবমেশিনগান, স্টেনগান, রাবার বুলেট, ওয়াকীটকি, চাইনিজ রাইফেল, সেভেন এমএম রাইফেল, এসএলআরও এখন হয়ে উঠেছে সহজলভ্য।

সারা দেশ জুড়েই শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি বড় বেশি অস্থির। নাজুক। অশান্ত। প্রতিদিনই কোনো না কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে খবর আসছে মারপিটের। প্রতি সপ্তাহেই কমপক্ষে দু'টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে। কোত্থেকে যেনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষসমূহের হাতে উঠে আসছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। সে অস্ত্র ব্যবহারেও কোনো লুকোচুরি নেই। রাখ্ ঢাক নেই।

সুতোয় টান পড়লেই পুলিশ এসে হাজির। বিডিআরও। তবে ভূমিকা প্রধানতঃ দর্শকের। সংঘাত বেড়ে গেলে ক্রলিং কিংবা নিরাপদ দূরত্বের দর্শক।

মঞ্চে-বক্তৃতায়-বিবৃতিতে এই সন্ত্রাস-অস্ত্রবাজি-নৈরাজ্যের নিন্দা করছেন ছাত্রনেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও কথা বলছেন এর বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসবিরোধী সর্বদলীয় শান্তি সম্মেলন হয়েছে। সেই সম্মেলনে সন্ত্রাস নির্মূলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসের অবসান হয়নি। বরং পরদিন থেকে আরও যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে সন্ত্রাসকারীরা তাদের তৎপরতা তীব্র করেছে। ওয়েস্টার্ন ছবির স্টাইলে মুখোমুখি হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের।

পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত সবাই। শংকিতও। অনেকেই বলছেন, এমনটিতো হবার কথা ছিলো না। আশির প্রায় পুরোটা দশক জুড়ে যারা মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একজোট থেকেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে ঝটিকা সফর, সভা-সমাবেশ-মিছিল করে জনমত গড়ে তুলেছেন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে শাসকের প্রত্যক্ষ মদদে লালিত যুদ্ধবাজ মাস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছেন। অপসারণ করেছেন সন্ত্রাসের লালনকারী সেই শাসককেও- সমগ্র জাতি যখন গণতন্ত্র বিনির্মাণের কষ্টকর অভিযাত্রায় পথ চলছেন, তখন তারাই আবির্ভূত হয়েছেন সন্ত্রাসের লালনকারী শক্তি হিসেবে। গণতন্ত্রের যে বিজয় তারা রক্ত-ঘাম-শ্রমে অর্জন করেছেন, নিজেরাই আগ্ বাড়িয়ে অনিশ্চিত সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন তা।

সন্ত্রাসের সর্বব্যাপী বিস্তার দেখে কেউ কেউ আশংকা করছেন- গোটা বিষয়টাই বোধকরি একটি ছক বাঁধা পরিকল্পনার অংশবিশেষ; নব্বুইয়ের ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেবার যে সম্মিলিত আকাংক্ষা এবং প্রয়াস জন্ম নিয়েছিলো তার বিকাশ অঙ্কুরেই রুদ্ধ করবার একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত।

ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের পরাজিত শক্তি এবং সমাজকে যারা পশ্চাৎমুখি যাত্রায় নিয়ে যেতে চায় সেই সাম্প্রদায়িক মহল পরিস্থিতির সুযোগ নেবে, নেবার চেষ্টা করবে- এটা স্বাভাবিক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে তাঁর বাসভবনে সপরিবারে আটকে রেখে 'সাবজেল' ঘোষণা তাই আমাদের বিস্মিত করে না। একাত্তরের পরাজিত শক্তি যখন প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের কর্মী-নেতাদের হাত-পায়ের রগ কেটে দিয়ে বর্বর উল্লাসে মেতে ওঠে- তখন আমরা শিউরে উঠি, অবাক হই না। কিন্তু ঘটনাতো শুধু সেই বৃত্তেই আটকে নেই।

এই সেদিনই, অস্ত্রবাজদের যারা শিক্ষাঙ্গন থেকে উৎখাতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন, তারা আজ নিজেরাই নেতা হয়েছেন অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসী শক্তির। সবাই নন, কিন্তু যারা ছাত্র রাজনীতির নির্ধারক শক্তি, এ মুহূর্তে, অবাক বিস্ময়ে আমরা তাদের লক্ষ্য করি সন্ত্রাসের মাঠে সদর্প পদচারণায়। ছাত্র রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাসী শক্তির এই তীব্র উত্থান ম্লান করে দিয়েছে এই জনপদে ছাত্র রাজনীতির কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে।

দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে, প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় যে খবর ছাপা হচ্ছে তা থেকে ৫টি ছাত্র সংগঠনকে সহজেই আলাদা করে নেয়া যায়। ১. জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ২. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-অ), ৩. ইসলামী ছাত্রশিবির, ৪. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ) এবং ৫. বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, সারাদেশে এই সংগঠন ক'টিই মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিপক্ষের। প্রধানতঃ ব্যতিক্রমী দু'একটি ঘটনা ছাড়া এরাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ এবং সামান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করেই জ্বলে উঠছে স্ফুলিঙ্গ, বিস্তার লাভ করছে সন্ত্রাস।

ক্ষেত্রবিশেষে ৫টি শক্তিই সন্ত্রাসকে আশ্রয় করে সংগঠনের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। তবে এক পক্ষ সন্ত্রাসকেই বেছে নিয়েছে শিক্ষাঙ্গনে প্রাধান্য বিস্তারের কৌশল হিসেবে। সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী শক্তিকে এরা সযত্নে লালন করছে আক্রমণাত্মক কৌশলের অপরিহার্য অংশ বিবেচনায়। অন্যপক্ষ নিয়েছে সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে মোকাবেলা করে সংগঠনের প্রাধান্য বজায় রাখার নেতিবাচক কৌশল। এদের ভূমিকা রক্ষণাত্মক।

কৌশল	ছাত্র-সংগঠন
আক্রমণাত্মক	১. জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ২. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-অ) ৩. ইসলামী ছাত্রশিবির
রক্ষণাত্মক	১. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ) ২. বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী

ওপরের ছক অনুযায়ী এই ৫টি সংগঠনকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একপাল্লায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-অ) এবং ইসলামী ছাত্রশিবির, অন্য পাল্লায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ) এবং বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী।

উগ্র ফ্যাসিবাদী শক্তি হিসেবে জামাত সমর্থিত ছাত্রশিবির ইতিপূর্বেই একাধিক ঘটনার মাধ্যমে সন্ত্রাসী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। স্বাধীনতাযুদ্ধে ন'মাসের প্রতিটি অধ্যায়েই এই সংগঠনের ভূমিকা আমরা ভুলিনি। নতুন করে আবার এই মৌলবাদী শক্তি তার উত্থানের সময়ে যে হিংস্র হয়ে উঠবে- তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অন্য ৪টি সংগঠন। এদের ক্ষেত্রে জবাবটা কি? বিগত ছাত্র আন্দোলনে এই ৪টি সংগঠনই গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী। স্বেচ্ছায় সেই কৃতিত্বে এই কলংকের দাগকে কেনো তারা আহ্বান জানাচ্ছেন!

সন্ত্রাসের ব্যাপক ব্যাপ্তি সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হলেও- এ সেই বিষবৃক্ষের ফল, যে বীজ একদিন আমরা বপন করেছি নিজেরাই। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসে, শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে, এমনটিই হওয়ার কথা ছিলো। একমাস-দু'মাসে নয়, গত ক'বছর ধরে অবক্ষয়ের যে বীজ আমরা পরিচর্যা করেছি, একসঙ্গে তার সবক'টি বৃক্ষেই আজ ফুল ধরেছে। সন্ত্রাসের ফুল। যে ফুল সাময়িক আকর্ষণে বাঁধে লক্ষ্যহীন তারুণ্যকে, রোমান্টিকতাকে, আবেগকে। একই সঙ্গে ধীর লয়ে লুপ্ত করে তার যুক্তিবাদী মনন। মেধা।বিবেচনাবোধ।

এদেশের ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের সংযোজন নতুন কোনো উপাদান নয়। পাকিস্তান আমলেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় সব শাসকের আমলেই সন্ত্রাস কম-বেশি হয়েছে। সন্ত্রাসের প্রয়োজনে মাস্তানদের লালনও করা হয়েছে দলে। রকমফের ছিলো, কিন্তু অস্ত্রবাজির চর্চা কম-বেশি হয়েছে। তবে অস্ত্র কখনো রাজনীতির নিয়ন্তা হয়ে ওঠেনি। রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করেছে অস্ত্রকে, অস্ত্রবাজকে।

৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ছাত্র রাজনীতিতে আবার অস্ত্র প্রাধান্য পেতে থাকে। অস্ত্রবাজও। অস্ত্রই হয়ে উঠতে থাকে রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। আজ বিএনপি সরকারের আমলে, এ সত্য তাদের জন্যে অপ্রিয় এবং বুমেরাং হলেও, এ ধারার সূচনা সে সময় প্রথম ঘটে এই দলটির ছাত্র সংগঠনেই। যারা মাস্তান হিসেবে ব্যবহৃত হতেন, তারাই নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন ছাত্র সংগঠনের। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় নেতৃত্বই ক্রমাগত দখল করতে থাকেন তারা। রাজনীতির 'অস্ত্র' যতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে ততোই অস্ত্রের উত্তরণ ঘটতে থাকে রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়।

৮০-র দশক জুড়ে ছাত্রলীগ (শা-অ) একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা ছিলেন তা নয়। এই সময়কালে তারাও সংঘাতে জড়িয়েছেন। 'অস্ত্র' রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেনি কখনো। ভুল হোক, ঠিক হোক প্রধানতঃ রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করেছে তার অস্ত্রকে। এই চিত্র খুব দ্রুত পাল্টে যায় '৯০ অভ্যুত্থানের পর থেকে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির প্রাধান্য থাকবার পরও ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোয় ছাত্রদলের ব্যাপক সাফল্য, পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিএনপির সাফল্যকে সহজ সমীকরণে দাঁড় করিয়ে ছাত্রলীগ (শা-অ)ও ছাত্রদলের পথ অনুসরণের জন্যে কৌশল পাল্টে ফেলে। ছাত্র রাজনীতি এবং জাতীয় রাজনীতিতে বিএনপি'র সাফল্যের মূল রাজনৈতিক বিষয়টিকে সঠিকভাবে বিবেচনায় আনতে না পারার কারণেই এই বিভ্রান্তি।

অন্যদিকে, প্রথম পর্যায়ে ছাত্রদল, পরবর্তীতে ছাত্রলীগ (শা-অ) এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের ত্রিমুখী আক্রমণের মধ্য থেকে ছাত্রলীগ (না-শ) এবং ছাত্রমৈত্রী সংগঠনের অভ্যন্তরে ঘটাতে থাকে শক্তি সমাবেশ। গ্রহণ করে আক্রমণকে পাল্টা আক্রমণ দিয়ে প্রতিহত করে সংগঠনের প্রাধান্য বজায় রাখার কৌশল।

সরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঔদাসিন্যমাখা প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠে, ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের চর্চা। এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্রমান্বয়ে জিম্মি হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসের।

রাজনীতি যদি আবার তার কর্তৃত্বে ফিরে আসতে না পারে, সম্মিলিত উদ্যোগ হয়তো সাময়িক স্বস্তি আনতে পারবে কিন্তু সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি ক্রমশঃই বাড়াতে থাকবে তার সীমানা।

মারুফ চিনু ঃ সাংবাদিক, সাবেক ছাত্রনেতা।